জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
UN Year of Microcredit 2005
জুলাই ২০০৫ July 2005
১৭শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা Volume-XVII, No. VII

বাংলাদেশে অভিবাসন
একটি পর্যবেক্ষণ

ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপুল প্রসার এবং সম্পদের অসম বণ্টন অভিবাসন ত্বরান্বিতকরণ ও নতুন অভিবাসন গতিবিজ্ঞান উদ্ভবে বড় ধরনের বাহ্যিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বায়ন অনেক এলাকায় যেমন উন্নয়ন ঘটিয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক অসমতা বাড়িয়ে রাষ্ট্রের ভেতরে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এসেছে দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বা জীবিকার সুযোগের মুল্যে। অনিয়ন্ত্রিত বাজার শক্তি, কাঠামোগত অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও অদক্ষ সরকারি নীতির কারণে অনেক জীবিকা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে লোকে তাদের স্বদেশভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

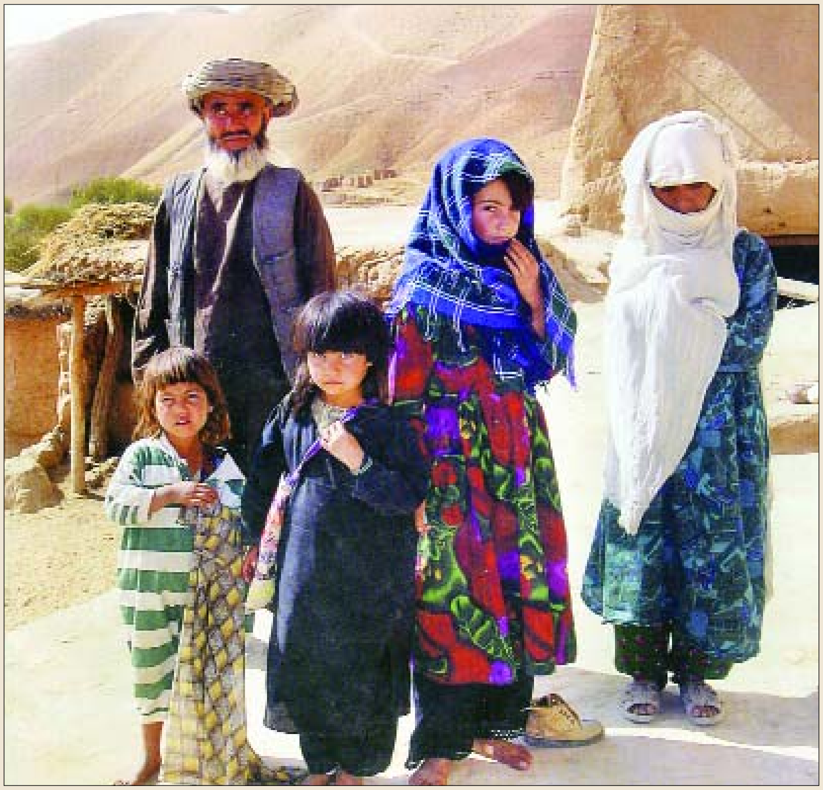

ইতিহাস

বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন শুরু হয় কয়েকশ' বছর আগে, লোকে যখন আজকে যা বাংলাদেশ নামে পরিচিত সেখান থেকে শ্রীলঙ্কা পাড়ি জমায়, যেখানকার জনসংখ্যায় আজ সিংহলিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আজকে যা অভিবাসন নামে পরিচিত তার মুল নিহিত রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে।

১৮শ' শতক থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, প্রধানত চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর নাবিকরা ব্রিটিশ সওদাগরি জাহাজে চাকরি নিয়ে কলকাতা বন্দর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াত। আজকে বাংলাদেশ একটি বড় ধরনের শ্রমিক উদ্বৃত্ত রাষ্ট্র এবং ক্রমবর্ধমান চুক্তির উৎস ধরে শ্রমিক অভিবাসন ঘটছে। একইসঙ্গে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রবাসী সম্প্রদায়।

কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসী বাংলাদেশীদের মোট সরকারি সংখ্যা বেড়ে চলেছে। হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে সকল আন্তর্জাতিক অভিবাসীর শতকরা ৯০ ভাগ গেছে যুক্তরাজ্যে।

পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অভিবাসনের তুলনায় মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চাকরির সুনির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে অভিবাসন হচ্ছে স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থানের জন্য এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে অভিবাসীরা দেশে ফিরে আসছে।

অভিবাসন প্রবাহ ও কর্মসংস্থানের দেশ

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো শিল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্পর্কে সরকারি কোনো হিসাব নেই, যা রয়েছে তা কেবল আনুমানিক সংখ্যা। আগেই বলা হয়েছে, কেবল শ্রমিক অভিবাসীদের সম্পর্কে সরকারি উপাত্ত আছে। বিএমইটির সরকারি উপাত্তে দেখা যায় যে, ১৯৭৬ থেকে ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মোট ৪০ লাখের বেশি অভিবাসী শ্রমিক নিবন্ধনভুক্ত হয়েছে। এ হিসাব সঠিক চিত্র বহন করে না। একদিকে একজন অভিবাসী শ্রমিকের একাধিক নিবন্ধনভুক্তি হতে পারে, যদি সে ২৯ বছরের কম-বেশি সময়ের মধ্যে একবারের বেশি দেশের বাইরে গমন ও প্রত্যাগমন করে থাকে- অল্প কিছু দিনের জন্য বাংলাদেশীরা সাময়িকভাবে দেশে আসলেও তাদের অভিবাসনকে একবার হিসাবে ধরা। অপরদিকে শ্রমিক অভিবাসনের হিসাব সরকারি উপাত্তে আসে না।

বিএমইটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭৬ থেকে ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত ৪০ লাখ ৩৮ হাজার ১শ' ৯৮ জন বাংলাদেশি সরকারি সূত্রে দেশত্যাগ করেছে। বাংলাদেশে অভিবাসীর বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। কর্মসংস্থানের জন্য যারা বিদেশে যায় তাদের বেশির ভাগই অদক্ষ শ্রমিক। তবে উপাত্ত থেকে এখন অর্ধ-দক্ষ ও অদক্ষ অভিবাসী শ্রমিকের তুলনামূলকভাবে উচ্চ আনুপাতিক হারের একটা সঙ্গতিপূর্ণ পর্যায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৭৬ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত হিসাবে দেখা গেছে যে, কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশগামীদের শতকরা ৪৭.৫৭ ভাগ অদক্ষ আর শতকরা মাত্র ৪.৫৪ ভাগ পেশাজীবী।

মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য হলো সৌদি আরব। বিগত ২৯ বছরে বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের অর্ধেকই এ দেশে অভিবাসন করেছে। সৌদি আরবের (২০ লাখ ৭৪ হাজার ৩শ' ৬৭) পরের স্থান সংযুক্ত আরব আমিরাত (প্রায় ৫ লাখ ১৮ হাজার ৮শ' ১৮) ও কুয়েত (সরকারিভাবে ৪ লাখ ১৩ হাজার ৬৭ অভিবাসী শ্রমিক), ওমান (২ লাখ ৩৭ হাজার ৮শ' ৭৮) এবং অপেক্ষাকৃত কম গেছে বাহরাইন, কাতার, লিবিয়া ও ইরাকে (১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত)। অপরদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া হলো প্রধান গন্তব্য দেশ, যেখানে সরকারিভাবে ২৯ বছরে ২ লাখ ৫০ হাজারের বেশি শ্রমিক অভিবাসী গমন করেছে। সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়াও উলে-খযোগ্যসংখ্যক শ্রমিক গ্রহণ করেছে, তবে অপেক্ষাকৃত কম। বিগত বছরগুলোতে সবচেয়ে পছন্দের দেশ হিসেবে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও অভিবাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রেরিত অর্থ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ বেকারত্ব কমানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি ও দক্ষতা স্থানান্তরের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যান্য অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি সুফল হলো প্রেরিত অর্থ। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে প্রাপ্ত অর্থ ছিল ৩শ' ৮৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রেরিত অর্থ ৩শ' ৩৭ কোটি ডলারের চেয়ে শতকরা ১৪ দশমিক ৫ ভাগ বেশি। সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক প্রেরিত অর্থ ১০ হাজার কোটি ডলারের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় আসে এর শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে প্রেরিত অর্থের মধ্যে বাংলাদেশে আসে শতকরা ১২ ভাগ, যা

বিশ্বব্যাপী প্রেরিত অর্থের শতকরা ২ ভাগ। উৎসভেদে এসব অঙ্কে তারতম্য হয়। বিশ্ব উন্নয়ন সূচক ২০০০ অনুযায়ী প্রেরিত অর্থের অঙ্কে ভিন্নতা রয়েছে, যার কারণ হলো বেসরকারি মাধ্যমে যে অর্থ প্রবাহিত হয় তার হিসাব নিরূপণ করা বেশ কষ্টকর।

অভিবাসীদের নিজ দেশে প্রেরিত অর্থের বড় সুফল হলো বিনিয়োগের ধরন, পারিবারিক ব্যয়, আয় ও শ্রম বাজারের ধরনে পরিবর্তন। অর্থ যেখানে প্রেরিত হয় সেখানকার বেকারত্ব হ্রাসে তার একটা বিরাট প্রভাব পড়ে। অনেক দেশের জন্য এটা বৈদেশিক মুদ্রার একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অভিবাসনেরও সুফল রয়েছে। যেমন উচ্চশিক্ষিত ও অনেক ক্ষেত্রে বিত্তশালীদের মধ্যে কেউ বাইরে গেলে তাদের শূন্য স্থান সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্তদের দ্বারা পূরণ হতে পারে।

বাংলাদেশে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা

২০০১ সাল পর্যন্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক অভিবাসনের দায়িত্বে ছিল। ২০০১ সালের শেষে প্রবাসী বাংলাদেশী ও অভিবাসী শ্রমিকদের দাবির প্রেক্ষিতে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। নতুন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের (MEWOE) দায়িত্ব হলো অভিবাসীরা যখন দেশে ফিরে আসবে বা বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে তখন তাদের গন্তব্যের দেশ ও বাংলাদেশে তাদের অধিকার এবং স্বার্থ দেখা। আরো সুনির্দিষ্টভাবে মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধির মধ্যে রয়েছে :

১. প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা,
২. বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা,
৩. সম্পদের সামর্থ্য প্রতিযোগিতামুলক পর্যায়ে উন্নীত করা,
৪. শ্রমশক্তির দক্ষতা গড়ে তোলা।

এমইডব-ওইর অধীনে আরো দুটি সরকারি সংস্থা আছে। বিএমইটির দায়িত্ব হলো শ্রমিক অভিবাসন বৃদ্ধি ও অভিবাসীদের কল্যাণ রক্ষা এবং শ্রমিক অভিবাসীদের প্রশিক্ষণে এমইডব-ওইর পরিকল্পনা ও নীতি বাস্তবায়ন করা। এসব কাজের মধ্যে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিওইএসএল-এর কাজ হলো অন্যান্য সরকার ও ব্যক্তির কাছ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো ও সেগুলোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। এছাড়া, সংস্থা অন্যান্য দেশে বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি করে।

নীতি

বাংলাদেশ সরকারের অভিবাসন নীতি প্রধানত শ্রমিক অভিবাসনমুখী। ১৯৭৬ থেকে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার শ্রমিক অভিবাসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো শ্রমিক অভিবাসনকে বেকারত্ব লাঘব ও বৈদেশিক আয় সৃষ্টির একটা উপায় হিসেবে দেখা হয়। শ্রমিক অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনটি হলো ১৯৮২ সালের বহির্গমন অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশের আওতায় শ্রমিক অভিবাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাকে দেশের বাইরে অভিবাসন বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পরবর্তী পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলোতেও শ্রমিক অভিবাসনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এসব পরিকল্পনায় উন্নয়নের সকল কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ পরিকল্পনায় বৈদেশিক শ্রমিক অভিবাসন এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে নারী শ্রমিক অভিবাসনের বিষয়ে একটা ব্যতিক্রম করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে কয়েক শ্রেণীর নারী শ্রমিক, বিশেষ করে অদক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করা। এই নিষেধাজ্ঞা ১৯৮৮ সালে শিথিল করা হলেও ১৯৯৭ সালে পুনরায় আরোপ করা হয়। সে সময়ে কয়েক শ্রেণীর পেশাজীবী নারীরও বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হতো না। এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার উপায় খুঁজে দেখছে মন্ত্রণালয় এবং নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য ধীরে ধীরে কাজ করছে। সরকার বর্তমানে একটি বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতির খসড়া তৈরি করছেন।

উপসংহার

গন্তব্যের দেশগুলোতে অভিবাসন সেসব শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করে যা স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায় না, অভিবাসী শ্রমিক তুলনামূলকভাবে সস্তা ও সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। বাংলাদেশের মতো যেসব দেশ থেকে অভিবাসন হয়, সেসব দেশের জন্য অভিবাসন জীবিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ পছন্দ, আয়ের উৎস ও প্রবাসীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সুযোগ এনে দেয়। অবশ্য যে দেশ থেকে যাবে বা যে দেশে যাবে, তা নির্বিশেষে যেকোনো দেশের জন্যই অভিবাসন ফলদায়ক হতে হলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমন্বয় করে অভিবাসন ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল কিছু কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে : কেবল সে ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের জন্য অভিবাসন পুরোপুরি কল্যাণকর হতে পারে।

মানবাধিকার রক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা

লেসলাই পলটি

মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে জাতিসংঘ দ্ব্যর্থহীনভাবে সকল ধরনের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে; কিন্তু সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের একটি অধিকারভিত্তিক উপায় অন্বেষণের প্রচেষ্টা স্পষ্টত প্রতীয়মান নয়। সন্ত্রাসবাদবিরোধী আলোচনা নির্ভর করে মানবাধিকার রক্ষা ও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করার ওপর। সন্ত্রাসবাদবিরোধী কার্যকর ব্যবস্থাগুলো কি মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? রাষ্ট্রসমূহের জন্য কি তাদের জনগণকে সন্ত্রাসবাদের হুমকি থেকে ভালোভাবে রক্ষার জন্য আপোসরফা ও আইনের শাসন লঙ্ঘন করা প্রয়োজন?

২০০২ সালের নভেম্বরে মহাসচিব কফি আনান বলেছেন যে, "আরো বেশি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধের ওপর একটি প্রণিধানযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করায় লালিত অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য আমাদের দিতে হবে তা নিয়ে উৎকণ্ঠা বেড়ে যাওয়ায়" ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা এই উভয় সঙ্কটকে আরো তীব্র করেছে। তিনি বলেন, "আমরা আধুনিক জীবনের সমাধানে প্রায় অসম্ভব একটি সংঘাতের মুখে রয়েছি– আমাদের নাগরিকদের চিরাচরিত নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং একই সঙ্গে বিপর্যয়কর পরিণতির সন্ত্রাসী হামলা থেকে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সন্ত্রাসবাদবিরোধী ব্যবস্থা এবং মানবাধিকারের মান অনুসরণের মধ্যে ভারসাম্য বিধানের প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। মি. আনান বলেন, তা না হলে সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াই 'আত্মপরাজয়ে' পর্যবসিত হবে।

জাতিসংঘের জন্য মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা সন্ত্রাসবাদবিরোধী যেকোনো ব্যাপক কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যে জাতিসংঘের নির্দেশিকাগুলো যে মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকে গুরুত্ব দেয় তা সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ ও মানবাধিকার কমিশনের বেশ কয়েকটি প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব প্রস্তাবে জোর দেয়া হয় যে, "রাষ্ট্রসমূহকে নিশ্চিত করতে হবে যে, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় গৃহীত যেকোনো ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তাদের সকল বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।"

সন্ত্রাসবাদবিরোধী ব্যবস্থায় যাতে "সদস্য দেশসমূহের পঞ্চাশটি বছর ধরে সযত্নে গড়ে তোলা মানবাধিকার আইন খর্ব না হয়" তা উলে-খ করে আন্তর্জাতিক জুরি কমিশন (আইজেসি) সন্ত্রাসবাদবিরোধী প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে যে কয়েকটি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার তালিকা দিয়েছে : নির্যাতন থেকে মুক্তি, জীবনের অধিকার; অযৌক্তিক আটক থেকে মুক্তি, আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কোনো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে ন্যায়বিচারের অধিকার; সভা-সমিতি ও প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিরাপদ আশ্রয় ও বৈষম্যহীনতার অধিকার।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করতে গিয়ে

মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করার বিষয়টি সাধারণ পরিষদের নতুন কোনো উদ্বেগ নয়। ১৯৯৭ সালে মানবাধিকার উন্নয়ন ও রক্ষা সংক্রান্ত সাব-কমিশন মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবাদের ওপর একটি ব্যাপক সমীক্ষা চালানোর জন্য একজন বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার নিয়োগের সুপারিশ করে। বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার ক্যালিয়োপি কফা উলে-খ করেন যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার আলোকে তাঁর সম্পাদিত কাজটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তিনি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ২০০২ সালের জুলাইতে অগ্রগতি রিপোর্টে তিনি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও ব্যবস্থাসমূহের গৃহীত মন্তব্য, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করেন।

বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের ব্যাপ্তি ঘটার প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদ ও মানবাধিকারের বিষয়টি বেশি জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের গুরুত্ব স্বীকার করার পাশাপাশি জাতিসংঘের কয়েকটি সংস্থা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, পাল্টা ব্যবস্থায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। ২০০৪ সালের জুলাইতে আইসিজে বলেছে যে, 'কোনো কোনো দেশে সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াই জাতীয় নিরাপত্তার নামে পরিচালিত দীর্ঘস্থায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলোকে বড় ধরনের বৈধতা দিয়েছে', যার কারণে বিশেষ করে 'বিচার বিভাগের কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সশস্ত্র বাহিনীর কাছে পর্যাপ্ত বিচার বিভাগীয় পুলিশি ক্ষমতা' ন্যস্ত করার মাধ্যমে 'বিচার বিভাগীয় কার্যাবলির ক্রমবর্ধমান সামরিকীকরণের' মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও উদ্বাস্তু আইনে উদ্বেগজনক ধস নেমেছে।

জাতিসংঘ ব্যবস্থা যে বিষয়টির ওপর জোর দেয় তা হলো, এমনকি জরুরি অবস্থার মধ্যেও মানবাধিকারের নিয়মগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণের চ্যালেঞ্জ

সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াই নিরাপত্তা পরিষদের একটা দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ। ১৯৬৩ সাল থেকে শুরু করে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের একটা আইনি কাঠামো গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বহুপক্ষীয় বারোটি প্রধান কনভেনশন রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের মূল উপাদান। কিন্তু এই অগ্রগতি সত্ত্বেও পরিষদের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো স্বয়ং সন্ত্রাসবাদেরই সংজ্ঞা। বারোটি কনভেনশনের প্রতিটির নির্ভরতা হলো নির্দিষ্ট সন্ত্রাসী 'কার্যকলাপ' ভিত্তিক একটি 'কার্যোপযোগী' সংজ্ঞা। তাই, বোমাবাজি, ছিনতাই, জিম্মি করা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য গোপন অর্থায়নের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে আলাদা আলাদা চুক্তি রয়েছে; কিন্তু একটা সার্বজনীন সংজ্ঞা এখনো গ্রহণ করা যায়নি।

১৯৯৬ সাল থেকে সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ (আইন বিষয়ক) কমিটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে একটি ব্যাপক কনভেনশনের খসড়া প্রণয়ন করছে, যাতে সন্ত্রাসবাদের একটা সংজ্ঞা থাকবে। তবে সন্ত্রাসী কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় করা হবে তা নিয়ে মতদ্বৈধতার কারণে আলোচনা বন্ধ হয়ে আছে। তাই সদস্য রাষ্ট্রগুলো 'এক লোক সন্ত্রাসী আর এক লোক মুক্তিযোদ্ধা' এই জ্ঞানগর্ভ অভিহিতকরণের কাজটি সমাধা না করা পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের সর্বজনীন সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকবে।

মানবাধিকার হাই কমিশনারের দপ্তরের (OHCHR) কাছে সন্ত্রাসবাদবিরোধী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষার উচ্চ অগ্রাধিকার রয়েছে। এই দপ্তর সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের নামে অনেক দেশের ক্রমবর্ধমান হারে গৃহীত নীতি, আইন ও চর্চার সংখ্যাধিক্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে সকল মানবাধিকার ভোগের ওপর নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলে। 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটির নির্বিচার ব্যবহার এবং ফলশ্রুতিতে নতুন ধরনের বৈষম্য সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বিপদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওএইচসিএইচআর জোর দিয়ে বলেছে যে, আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংবিধি এবং নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অসম্মানজনক আচরণ বা শাস্তি বিরোধী কনভেনশন অনুসারে কয়েক ধরনের অধিকার খর্বযোগ্য নয়, যার অর্থ হলো এগুলো স্থগিত করা যাবে না, এমনকি জরুরি অবস্থার সময়ও নয়। অবশ্য, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকির ফলে, অত্যন্ত নির্দিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থায়, কোনো রাষ্ট্র জরুরি অবস্থা জারি করতে পারে, যার আওতায় কতিপয় অধিকার খর্বকরণ বা স্থগিতকরণ সাপেক্ষ।

২০০৩ সালে ওএইচসিএইচআর প্রকাশিত The Digest of Jurisprudence of the UN and Regional Organizations on the Protection of Human Rights while Countering Terrorism খর্বযোগ্য নয় এমন অধিকারসমূহ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এর প্রধান কাজ হলো একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, যার আওতায় মৌলিক স্বাধীনতার ওপর প্রতিকূল প্রভাব না ফেলে সন্ত্রাসবাদ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যাবে এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধী আইনানুগ ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ও আনুপাতিকতার মূল নীতিমালা নির্ধারণ করা। ২০০৩ সালে সাধারণ পরিষদে বিপক্ষে একটি ভোটে গৃহীত ৫৭/২১৯ প্রস্তাব 'সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলাকালে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার রক্ষা'-এর

আওতায় ওএইচসিএইচআরকে সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও ব্যবস্থাসমূহ বিশ্লেষণ এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা এগিয়ে নেয়া ও রক্ষা করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবাবলি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলাকালে মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদের প্রচেষ্টা তার ১৪৫৬ (২০০৩) প্রস্তাবের ভিত্তিতে চালানো হয়, যাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "রাষ্ট্রসমুহকে নিশ্চিত করতে হবে যে সন্ত্রাসবাদ দমনে গৃহীত যে কোনো ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তাদের সকল বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, উদ্বাস্তু ও মানবিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।" ২০০২ সালের ১৮ জানুয়ারি সন্ত্রাসবাদবিরোধী কমিটির (সিটিসি) চেয়ারম্যান পরিষদকে অবহিত করতে গিয়ে বলেন যে, সিটিসিকে প্রস্তাব ১৩৭৩ (২০০১)-এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মানবাধিকার আইনসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের প্রেক্ষিতে পরিবীক্ষণের বিষয়টি কমিটির ক্ষমতার আওতার বাইরে।

বড় চ্যালেঞ্জ হলো সন্ত্রাসবাদবিরোধী পরিবীক্ষণ এবং মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধার মধ্যে একটা ভারসাম্য খুঁজে বের করা। জাতিসংঘ এবং সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক নীতি সম্পর্কিত কার্যগ্রুপের রিপোর্টের ১৬ নম্বর সুপারিশে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যে মানবাধিকার বিসর্জন দিয়ে নিরাপত্তা অর্জিত হতে পারে না : "জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারসহ সন্ত্রাসবাদবিরোধী কমিটির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার আইন, নীতি ও চর্চাসমূহ বাস্তবায়নকালে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করার গুরুত্ব সম্পর্কে সংলাপ চালিয়ে যেতে হবে।" সিটিসি মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুক হলেও মানবাধিকারের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সন্ত্রাবাদবিরোধী ব্যবস্থা পরিবীক্ষণের কোনো প্রণালিবদ্ধ উদ্যোগ এটা এখনো গড়ে তোলেনি। ২০০৩ সালের অক্টোবরে আইসিজে আয়োজিত এক সম্মেলনে মানবাধিকার উপকমিশনার বারট্রান্ড রামচরণ উল্লেখ করেন যে, "আইনের কাঠামোর মধ্যে এবং আনুপাতিকতার নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে।"

নিরাপত্তা পরিষদে সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াই

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ সনদের অধ্যায় ৭-এর আওতায় গৃহীত ১৩৭৩ (২০০১) প্রস্তাবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা এবং এসব কার্যকলাপে অর্থায়ন, এর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে সমর্থন জানায় বা অংশগ্রহণ করে এমন সকল পক্ষকে দোষারোপ করে। এতে আরো বলা হয় যে, অভ্যন্তরীণ আইনে এ ধরনের কার্যকলাপ গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি তাদের সন্ত্রাসবিরোধী উদ্যোগের তালিকা সংবলিত একটি রিপোর্ট সন্ত্রাসবাদবিরোধী কমিটির (সিটিসি) কাছে দাখিল করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সিটিসি প্রস্তাব ১৩৭৩ এবং সাধারণ পরিষদের গৃহীত সন্ত্রাসবাদ-সংশ্লিষ্ট অপর বারোটি কনভেনশন ও প্রোটোকলের প্রতিপালন পরিবীক্ষণ করে। ২০০৪ সালের মাঝ নাগাদ ৫শ'র বেশি রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে; কিন্তু সিটিসি বিশেষজ্ঞদের যুক্তি হলো যে, সন্ত্রাসবাদবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কিত কেবল তথ্যগ্রন্থনা বলবৎকরণে সহায়তার ক্ষেত্রে সামান্যই অবদান রাখে, কারণ যেকোনো আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের কার্যকারিতা তার বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করে। অবশ্য, প্রস্তাব ১৩৭৩-এর প্রতি সমর্থন সর্বজনীন নয়; কেননা ৭১টির মতো দেশ রিপোর্ট পেশের সময়সীমা প্রতিপালন করেনি।

সিটিসি সংস্কারের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ ২৬ মার্চ ১৫৩৫ (২০০৪) প্রস্তাবের মাধ্যমে একটি নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করে, যাতে কমিটির ক্ষমতা পরিবর্তন না করা হলেও তার কার্যপরিধি সম্প্রসারিত করা হয়। পুনরুদ্দীপ্ত কমিটিকে কৌশলগত ও নীতিগত সিদ্ধান্তের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পরিষদের সকল সদস্যের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং চেয়ার, ভাইস চেয়ারবৃন্দ এবং সমন্বিত বিশেষজ্ঞ ও সচিবালয় স্টাফ নিয়ে একটি ব্যুরো এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিশেষজ্ঞ জোয়েল সলিয়ার বলেন যে, কাঠামোগত ও পরিচালনগত পরিবর্তন হয়তো-বা সহায়ক হবে, কিন্তু 'রাজনৈতিক ইচ্ছে কম থাকলে কোনো কিছুই বদলাবে না।' তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিপাদন ব্যবস্থা থেমে আছে, কারণ এতে মুদ্রা ব্যবস্থা, পুলিশ, বহির্গমন, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও অর্থ সাদাকরণসহ এতো 'বেশি রাজনৈতিক স্পর্শকাতর ক্ষেত্র' জড়িত আছে যে, 'দেশসমূহ সিটিসি থেকে মুল্যায়ন গ্রহণেই ভীত।'

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ২০০৫ সালের ২১ মার্চ তাঁর 'বৃহত্তর মুক্তির লক্ষ্যে' : সবার জন্য উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার প্রত্যাশায় শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এ রিপোর্টে তিনি দারিদ্র্য, নিরাপত্তার প্রতি হুমকি ও মানবাধিকারের অপব্যবহার মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক নীতিগত অঙ্গীকার ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার তুলে ধরেছেন। জাতিসংঘ সনদের একটি অংশ থেকে রিপোর্টের 'বৃহত্তর মুক্তির লক্ষ্যে' নামটি নেয়া হয়েছে, যা ষষ্ঠিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জাতিসংঘ সংস্কারের

স্বাস্থ্য : কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

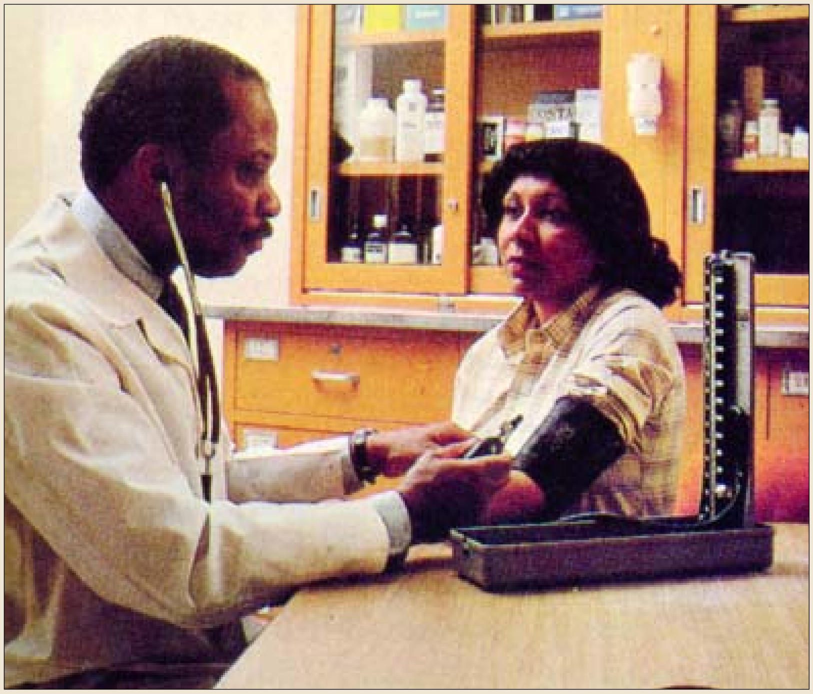

- করোনারি হার্ট ডিজিজ ও স্ট্রোকের সঙ্গে ১শ'র বেশি ঝুঁকির বিষয় জড়িত রয়েছে এবং এগুলো এখন সকল জনগোষ্ঠীতে উলে-খযোগ্যভাবে বিদ্যমান। উন্নত দেশগুলোতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ হৃদরোগের (CVD) জন্য দায়ী হলো তামাক ও সুরা ব্যবহার এবং উচ্চ রক্তচাপ। কম মৃত্যু হারের চীনসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসব ঝুঁকির বিষয় শীর্ষ দশের তালিকার ওপরে রয়েছে। আফ্রিকার উপসাহারার মতো উচ্চ মৃত্যু হারের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শীর্ষ ঝুঁকির বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরেলের উচ্চমাত্রা এবং তামাক ও সুরার ব্যবহার এবং খাবারে শাকসবজি ও ফলের কম পরিমাণ। ধূমপান বন্ধ, কোলেস্টেরেল ও রক্তচাপ কমানো, সুষম আহার ও দৈহিক কাজকর্ম বৃদ্ধির মাধ্যমে কিছু বড় বড় ঝুঁকি প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- খ্যাদ্যাভাস ও ধূমপানসহ ঝুঁকির বিষয়গুলো সারা বিশ্বে বহুলাংশে শৈশবে শেখা আচরণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং অল্প বয়সেই এগুলোর বহিপ্র্রকাশ ঘটতে শুরু করে। কৈশোরে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে দৈহিক কাজকর্ম উলে-খযোগ্যভাবেহ্রাস পায় এবং কেবল ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা নয় বরং যে চীন ও জাপানের জনগণ ঐতিহ্যগতভাবেই হালকা-পাতলা, সেখানেও স্থুলত্ব বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট পরিমাণে।
- শৈশব ও তরুণ বয়সে ঝুঁকির বিষয়গুলো মোকাবিলা করার কর্মসূচি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নত দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ, তাই জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। পরিবার, স্কুল, সমাজ, স্বাস্থ্য পেশাজীবী ও নীতিনির্ধারকসহ সবাইকে শিশু ও তরুণদের মধ্যে সুস্থ জীবনযাত্রা প্রণালি এগিয়ে নিতে হবে।
- উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন অকাল মৃত্যুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্যতম, যা প্রতিরোধ করা যায়। বেশির ভাগ দেশে বয়স্কদের মধ্যে সর্বোচ্চ শতকরা ৩০ ভাগ লোক উচ্চ রক্তচাপে ভোগে এবং শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে থাকবে যদি তারা দৈহিক কাজকর্মের মাধ্যমে শরীর কমায়, একটা আদর্শ ওজন বজায় রাখে এবং বেশি করে ফলমূল ও শাকসবজি খায়। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ আছে।
- বিশ্বে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হৃদরোগের কারণ কোলেস্টেরেলে মাত্রাধিক্য।
- সিগারেট পান করলে ফুসফুসের ক্যানসারের চেয়ে সিভিডি হওয়ার ঝুঁকি বেশি। যেসব লোক ১৬ বছর বয়সের আগে ধূমপান শুরু করে তাদের ঝুঁকি অনেক বেশি।

- খাদ্য প্রাপ্তি, গৃহীত খাদ্যের ধরন পরিবর্তন ও ব্যায়াম কমে যাওয়ার ফলে লোকে স্থূলকায় হয়ে পড়ছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন ও যান্ত্রিক যানবাহন দৈহিক কাজকর্ম কমিয়ে দিয়েছে, তাই বিশ্বের শতকরা ৬০ ভাগের বেশি লোক পর্যাপ্ত সক্রিয় নয়। চীনে মাত্রাতিরিক্ত ওজনের ৭ কোটি লোক রয়েছে, যে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের লোক শারীরিকভাবে সক্রিয় ও কৃশকায় ছিল, এখন তারাই স্থূলকায়ত্বের সর্বোচ্চ কয়েকটি হারের মধ্যে রয়েছে।
- করোনারি হার্ট ডিজিজ ও স্ট্রোকের জন্য ডায়াবেটিস একটা ঝুঁকির বিষয়। বিশ্বে ১৭ কোটির বেশি লোকের ডায়াবেটিস আছে এবং এ সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শৈশবে যে খাবার দেয়া প্রয়োজন তাতে পরিবর্তন এবং কম ব্যায়াম শিশুদের মধ্যে শ্রেণী-২ ডায়াবেটিসের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ। উন্নত দেশগুলোতে এর প্রকোপ বেশি। তবে আধুনিকতা ও জীবনযাত্রা প্রণালির পরিবর্তনের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও ভবিষ্যতে এটা মহামারী হয়ে দেখা দিতে পারে।
- জীবনযাত্রা প্রণালি ও আচরণ ধারা, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ না থাকা ও প্রতিনিয়ত চাপের মধ্যে থাকার কারণে সিভিডির বর্ধিত ঝুঁকির সঙ্গে নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা জড়িত।
- অক্ষমতার সঙ্গে মানিয়ে চলে জীবনের যে বছরগুলো (DALY) অতিক্রম করা সম্ভব তার শতকরা ১০ ভাগ খোয়ানোর জন্য হৃদরোগ দায়ী, যার পরিণতিতে মৃত্যু তো আছেই, তার সঙ্গে এই রোগ যে কতোটা বোঝা হয়ে চেপে থাকে, তা বোঝা যায়। সিভিডি নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশগুলোতে শতকরা ১০ ভাগ DALY খোয়ানোর জন্য দায়ী এবং উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে তা শতকরা ১৮ ভাগ।
- বিভিন্ন দেশে বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে যে ব্যবধান বিদ্যমান তাতেও হৃদরোগে মৃত্যু হারে তারতম্য দেখা যায়। করোনারি হার্ট ডিজিজে

জিনেটিক বিষয়ের একটা ভূমিকা তো আছেই, তদুপরি এ রোগে যে শতকরা ৮০ থেকে ৮৯ ভাগ লোকের মৃত্যু ঘটে, তাদের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রা প্রণালিকে প্রভাবিত করার মতো এক বা একাধিক বড় ধরনের ঝুঁকির বিষয় থাকে।
- করোনারি হার্ট ডিজিজে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশে মৃত্যুহার কমে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, করোনারি হার্ট ডিজিজে মৃত্যু হার শতকরা ৮২ ভাগে উন্নীত হয়েছে, এই মৃত্যু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঘটবে।
- লোকে অভিবাসন করলে হার্ট এটাকের ঝুঁকি বদলে যায়। জাপানে করোনারি হার্ট ডিজিজের হার কম; কিন্তু জাপানিরা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে ক্রমশ এ ঝুঁকি বাড়তে থাকে, বিশেষ করে যারা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে।
- প্রতি বছর বিশ্বে দেড় কোটি লোক স্ট্রোকের শিকার হয় : এর মধ্যে ৫০ লাখ মারা যায়, ৫০ লাখ স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পরিবার ও সমাজের ওপর বোঝা হয়ে থাকে। বড় ধরনের ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ ও তামাক ব্যবহার। অনেক উন্নত দেশে স্ট্রোকের ঘটনা কমে আসছে। যেখানে উন্নত প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা আছে সেখানেও যারা স্ট্রোকের শিকার হয় তাদের শতকরা ৬০ ভাগ হয় মারা যায়, না হয় পরনির্ভর হয়ে পড়ে। এসব পরিসংখ্যান ও চিকিৎসার উচ্চ ব্যয়ের নিরিখে প্রতিরোধমুলক কৌশলকেই উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।
- ডায়াবেটিসের কারণে স্থায়ী অক্ষমতার দরুন ২০০০ সালে ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ক্ষতি হয়েছে ৫ হাজার কোটি ডলার আর ইনসুলিন, হাসপাতালে ব্যয়, পরামর্শ ও সেবার জন্য ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৬০ কোটি ডলার।
- ডায়াবেটিস সংশ্লিষ্ট রোগের জন্য বিশ্বে স্বাস্থ্য বাজেটের শতকরা ৪ থেকে ৫ ভাগ অর্থ ব্যয় করা হয়।
- স্থূলত্ব ও শ্রেণী-২ ডায়াবেটিসের মতো স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ১৭ হাজার ৭শ’ কোটি ডলার ব্যয় হয়।

সিভিডি নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত এনজিওসহ সকল সংস্থা এবং আরো অগণিত সহযোগীর সামর্থ্য সিভিডি মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অপ্রতুল।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org